কল্যানীয়াসু

ট্রেটয়াকভ আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। পুরনো দিনের মহান সব শিল্পীদের আঁকা ছবি। দেখতে-দেখতে এগুচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। সঙ্গের রাশিয়ান গাইড বলল, কী হয়েছে?

আমি হাত উঁচিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্রিন্সেস তারাকনোভার পেইনটিং। অপূর্ব ছবি!

জরী, ছবিটি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল। গাইড বলল, সেন্ট পিটার্সবার্গ জেলে প্রিন্সেসের শেষ দিনগুলি কেটেছে। ঐ দেখ সেল-এর অন্ধকূপে কী করে বন্যার পানি ঢুকছে। দেখ, প্রিন্সেসের চোখে-মুখে কী গভীর বিষাদ। প্রগাঢ় বেদনা!

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাইড বলল, এস পাশের কামরায় যাই।

আমি নড়লাম না। মৃদু গলায় বললাম, মি. যোখভ আজ আর কিছু দেখব না। চল, কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।

দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা-ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মোটা ওভারকোট ভেদ করে শরীরে বিঁধছে। আমার সঙ্গী হঠাৎ জানতে চাইল, তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

না।

আর্ট গ্যালারি কেমন দেখলে?

চমৎকার। অপূর্ব!

আমি চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বললাম, তোমাদের প্রিন্সেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা মহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।

গাইড কৌতূহলী হয়ে বলল, কে সে? নাম জানতে পারি?

জরী তার নাম।

যোখভ বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, 'প্রিন্সেস জরী। প্রিন্সেস জরী।'

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাৎ করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুরুটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শেষরাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাত্রে কী স্বপ্ন দেখলাম জানো? দেখলাম, আমাদের নীলগঞ্জে যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে গিয়েছি (ইশ! কতদিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম)। বাবা বললেন, 'খোকা নাগরদোলায় চড়বি?' আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছি আর শাঁ-শাঁ শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে-দূরে আরো দূরে। ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আগের মতো সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বালা দেখি।

মস্কোতে আজ আমার শেষ রাত। আগামীকাল ভোর চারটায় রওনা হব রুমানিয়ায়। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা জোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘুরে বেড়াব। তারপর ফিরে যাব মন্ট্রিলে নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গতির জীবন বেছে নিয়েছি, তাই না? অথচ ছোটবেলায় এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কী মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। ধরা গলায় বলত, বড় মিয়া চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হত—দুর ছাই, কী হবে পড়াশুনা করে। বাবা, হাসু চাচা এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরমুখো টান ছিল বলেই আজ হয়তো যাযাবর বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়। তোমার জন্য প্রবল তৃষ্ণা পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাই নি? টেন্‌টেলাসের গল্প জানো তো? তার চারদিকে পানির থই-থই সমুদ্র অথচ তাকেই কিনা আজীবন তৃষ্ণার্ত থাকতে হল।

জরী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পরদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জে আসি তুমি ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে। তখন কার্তিকের শুরু। ধানীরঙের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সেসব কথা? আমি বলেছিলাম, মাথাটা ভেতরে টেনে নাও জরী। কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি বললে, পড়ুক।

কামরায় আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। বরযাত্রীরা আমাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিকঝিক করে। বাতাসে তোমার লালচে চুল উড়ছে।

কী-একটা সেন্ট মেখেছ। চারপাশে তার চাপা সৌরভ। আমি গাঢ় স্বরে বলেছিলাম, ছিঃ জরী এত কাঁদছ কেন? কথা বল। আমার কথায় তুমি কী মনে করেছিলে কে জানে। লজ্জা পেয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেইদিন কী গভীর আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল রহস্যমণ্ডিত এই রমণীটিকে পেয়েছি।

গৌরীপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ হল্ট করল। একজন অন্ধ ভিখারি একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরার সামনে খুব গান গাইতে লাগল, "ও মনা এই কথাটি না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।"

তুমি অবাক হয়ে বললে, কী সুন্দর গান। তারপর দুটি টাকা বের করে দিলে। ট্রেন ছাড়তেই জ্যানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলি বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতের শুরুতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাঁস উড়ে আসছিল। আগে দেখ নি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, বক নয় জরী। ওগুলি বালিহাঁস। আর শোন, আপনি আপনি করছ কেন? আমাকে তুমি করে বলবে।

ঐ হাঁসগুলি কোথায় যাচ্ছে?

বিলের দিকে।

আপনাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

আবার আপনি?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে?

আমি বললাম, বল, তোমাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুরু করলে। আমার মনে হল সুখ কোনো অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জোছনার মতোই এও আপনাতেই আসে।

কিন্তু প্রিন্সেস তারাকনোভার ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হল। মনে হল সুখটুখ বলে কিছু নেই। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নিয়ে আমাদের কারবার। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমারী পিটার্সবার্গের নির্জন সেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। হু-হু করে বন্যার জল ঢুকছে ঘরে। রাজকুমারীর ঠোঁটের কোনায় কান্নার মতো অদ্ভুত এক হাসি ফুটে রয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় মনে হল রাজকুমারীকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। জরীর মুখের আদল আসছে নাকি? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। না, জরীর সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নাই। জরীর মুখ গোলগাল। একটু আদুরে ভাব আছে। আর রাজকুমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ন। মনে আছে জরী, একবার তোমার একটি পোট্রেট করেছিলাম। কিছুতেই মন ভরে না। ব্রাশ ঘসি আবার চাকু দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলি। দু-মাসের মতো সময় লাগল ছবি শেষ হতে। পোট্রেট দেখে তুমি হতভম্ব। অবাক হয়ে বললে, ও আল্লা চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন? আমার চোখ বুঝি সবুজ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূরে সরে গেলে এবং চেঁচিয়ে বললে, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুগ্ধ কণ্ঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোট্রেটটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কী হয় বল? তার উপর সেবার খুব টাকার প্রয়োজন হল। মিলানে গিয়েছি বন্ধুর নিমন্ত্রণে। গিয়ে দেখি বন্ধুর কোনো হদিশ নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কী করি, কী করি! সঙ্গে সম্বলের মধ্যে আছে ত্রিশটি আমেরিকান ডলার আর মন্‌ট্রিলে ফিরে যাবার একটি টুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরানো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হল। শস্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দুদিন যেতেই টাকাপয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারোর যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দুটি ওয়াটার কালার আর তেলরঙে আঁকা তোমার পোট্রেট। ছবিগুলির মধ্যে 'নীলগঞ্জের জোছনা' নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ির পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখ নি তুমি? ঐ যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক

জোছনা রাত্রিতে পুকুরের কালো জলে তাদের ছায়া পড়েছিল— তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হল শুধু তোমার পোট্রেটটি। এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বললেন, কেন এই পোট্রেটটা কিনলাম জানো?

না ম্যাডাম।

আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে- মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তার মতো সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।

আমি হেসে বললাম, আপনি এখনো সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, রাতের খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়সী নানান ছবি দেখালেন। সবশেষে পিয়ানো বাজিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে— "হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালোবাসাবাসি দিয়ে সে দিনকে দূরে রাখা গেল না।"

নিজের হাতে তোমার ছবি টানালাম। কোথাকার ইটালির মিলান শহরের এক বৃদ্ধা মহিলা, তার ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে।

একশ বছর পর এই ছবিটি অবিকৃতই থাকবে। বৃদ্ধার নাতি-নাতনিরা ভাববে, এইটি কার পোট্রেট? এখানে কীভাবে এসেছে?

ফেরার পথে বৃদ্ধার হাতে চুমু খেলাম। মনে-মনে বললাম, আমার জরী যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

আমরা সবসময় সুখে থাকার কথা বলি। যতবার নীলগঞ্জ থেকে ঢাকার হোস্টেলে যেতাম— বাবা বলতেন, 'সুখে থাকো'। তুমি যখন লাল বেনারসীতে মুখ ঢেকে ট্রেনে উঠলে তোমার মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'সুখে থাকো'।

জরী, আমার কাছে তুমি সুখে ছিলে না? কিসে একটি মানুষ সুখী হয়? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে তোমার কি মন ভরে উঠে নি? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠ নি— ওমা এ যে রাজপ্রাসাদ! জোছনা রাত্রিতে হাত ধরাধরি করে যখন আমরা পুকুরপাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীর আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করে নি? তোমাকে আমি কী দেই নি জরী? নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার দেয়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখি নি?

তবু এক রাত্রিতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছ। বুকে ধ্বক করে

একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে জরী?

তুমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললে, কই কিছু হয় নি তো। তারপর নিঃশব্দে নিচে নেমে এলে।

তোমার মধ্যে গভীর একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধরতে পারি নি। শুধু বুঝতে পারছিলাম তোমার কোনোকিছুতেই মন লাগছে না। সে সময় 'এসো নীপবনে' নাম দিয়ে আমি চমৎকার একটি পেইনটিং করছিলাম। আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। একটি ভাঙা বাড়ির পাশে একটি প্রকাণ্ড ছায়াময় কদম গাছ। এই নিয়ে আঁকা। আমার শিল্পীজীবনের ভালো ক'টি ছবির একটি। ভেবেছিলাম বিয়ের বছরটি ঘুরে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুগ্ধ করব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুগ্ধ করল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছর হয়ে গেছে বিয়ের? ইশ কত তাড়াতাড়ি সময় যায়!

তোমার কণ্ঠে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল? ক্রমে-ক্রমে তুমি বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগলে। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কী হয়েছে জরী?

কই? কিছু হয় নি তো।

ঘুম আসছে না?

আসছে।

বলেই তুমি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান করতে লাগলে যেন ঘুমিয়ে আছ। আমি বললাম, জরী সত্যি করে বল তো তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

কোথাও বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

কক্সবাজার যাবে? হোটেল ভাড়া করে থাকব।

উঁহুঁ, ভাল্লাগে না।

আরো অনেকদিন পর এক সন্ধ্যায় ঘন ঘোর হয়ে মেঘ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ঝড়। দড়াম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালার পাট। বাজ পড়ছে ঘনঘন। ঘরের লাগোয়া জামগাছে শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। দুজনে বসে আছি চুপচাপ। তুমি হঠাৎ একসময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী কথা?

আগে বল রাখবে?

নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে। যিনি কলেজে তোমাদের অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালির জন্যে যাঁর কলেজের চাকরিটি গেছে। এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। কোনোরকমে দিন চলে। তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জে নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাঁকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে।

তুমি উজ্জ্বল চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন। সত্যি বলছি ফেরেশতা। তুমি আলাপ করলেই বুঝবে।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরি। মাত্র জমি নেয়া হয়েছে।

হোক দেরি। আনিস স্যার ততদিন থাকবে আমাদের এখানে। নিচের ঘর তো খালিই থাকে। একা মানুষ কোনো অসুবিধা হবে না।

একা মানুষ?

হুঁ। মেয়ে আর বউ দুজনের কেউই বেঁচে নেই। একদিনে দুজন মারা গেছে কলেরায়। আর মজা কী জানো? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ক্লাস নিতে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার বললেন, আজ বাড়ি যান। ক্লাস নিতে হবে না। আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা কী? কে আছে বাড়িতে?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই কি তোমাদের স্যার আসবেন এখানে?

হ্যাঁ, আসবেন। আমি লিখলেই আসবেন। লিখব স্যারকে?

বেশ, লেখ।

তুমি সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে। সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল। বসে-বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে। এবং এক সময় চিঠি শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে। তোমাকে সে রাতে ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল।

আহ, লিখতে-লিখতে কেমন যেন লাগছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াই। নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তয়োভস্কির 'রূপালী রাত্রি' পড়েছ? রূপালী রাত্রিতে আমার মতো একজন নিশি-পাওয়া লোকের গল্প আছে।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন আমাদের বাড়িতে? দিন-তারিখ এখন আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসী একজন ছোটখাটো মানুষ ভোরবেলা এসে খুব হইচই শুরু করেছিলেন। চেঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন—

সুলতানা, সুলতানা। তুমি ধড়মড় করে জেগে উঠলে। "ও আল্লা, কী কাণ্ড, স্যার এসে পড়েছেন"—এই বলে খালি পায়েই ছুটতে-ছুটতে নিচে নেমে গেলে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁয়ে সালাম করছ, আর তোমার স্যার বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি খুব হাসছেন। সেই সঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি খুশি হয়েছিলে তো? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোনোকিছুর জন্যেই কোনো মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলি ছবি আঁকলাম সে সময়। তোমার পোট্রেটটিও সে সময় করা। পোট্রেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘণ্টাখানিক বসতে হত তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ছটফট করে উঠতে, "এই রে, স্যারকে চা দেয়া হয় নি। একটু দেখে আসি। এক মিনিট, প্লিজ।" আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। এক কাপ চা তৈরি করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

মাঝে-মাঝে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধ-সমাপ্ত ছবিগুলি দেখতেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভালো বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভালো আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তাঁর প্রশংসা আমার সহ্য হত না। আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কী করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘৃণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে বসে আছেন কেন? বাইরে যান।

কোথায় যাব?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করছেন কেন আপনি?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটা খুব ধীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বঞ্চনা— এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জ্বর চলল দীর্ঘদিন। ঘুম হয় না, বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুখ বিসুখে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় একটি সুখকর স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। কিন্তু তুমি আগের মতোই দূরে-দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছোঁয়াচে রোগে আমি শয্যাশায়ী। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে না চললে সমূহ বিপদ।

তোমার স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চোখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম গলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শুনাই আপনাকে? আপনার ভালো লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে বলতাম, একা থাকতেই আমার ভালো লাগবে। আপনি নিচে যান। কেন বিরক্ত করছেন?

এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে?

না, না অসহ্য। আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বন্ধু শশধর ডাক্তার রোজ দু-বেলা আসেন আর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান উঠে নাকি বাবা? হাঁপানি তোমাদের বংশের অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট টের পাও?

একটু যেন পাই।

ডাক্তার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। "শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প-অল্প মালিশ করবে। সাবধান, মুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ।" ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী এই শিশিটিতে কী আছে জানো?

জানি না কী আছে?

তীব্র বিষ! সাবধানে তুলে রাখো।

তোমাকে কেন বললাম এ-কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুণ আত্মপ্রসাদ হল। দেখলাম তুমি সরু চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কী ভাবছিলে?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জন্ডিসের রুগীর মতো গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে থাকি। কত কী মনে হয়। কত সুখ-স্মৃতি, কত দুঃখ-জাগানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক-এক রাতে ঘন ঘোর হয়ে বৃষ্টি নামে। ঝমঝম শব্দে গাছের পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। শুয়ে-শুয়ে শুনি তুমি নিচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছ। আহ্, কীসব দিন কেটেছে।

একটি প্রশস্ত ঘর। তার একপ্রান্তে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড একটি পালঙ্ক। সেখানে শয্যা পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কী বিশ্রী জীবন। ডাক্তার চাচা কতবার আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না? বল, কেন?

আমি কী করে বলব?

যাও হাওয়া বদল করে আস। বউমাকে নিয়ে ঘুরে আস কক্সবাজার থেকে।

আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

এত তাড়া কিসের?

তাড়া আছে। আমি বলছি বউমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ও বউমা, বউমা।

তুমি তো প্রায় সময় থাকতে না, সেদিনও ছিলে না।

ডাক্তার চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুধু কি তিনি? এ বাড়ির সবক'টি লোক কৌতূহলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে-রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অসহ্য বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সান্ত্বনা আছে।

জরী, আমাদের এ বংশে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মৃত্যুও রহস্যময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হত পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মতো আছে? না, তা কি আর থাকে? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে খুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। ট্রেনে করে তুমি প্রথমবারের মতো নীলগঞ্জে আসছ সেখান থেকে। ঐ যে গৌরীপুরে ট্রেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভিখিরি একতারা বাজিয়ে করুণ সুরে গাইলঃ

ও মনা
এই কথাটি না জানলে
প্রাণে বাঁচতাম না।
ও মনা। ও মনা।

তুমি ভিখিরিকে দুটি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালোবাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বল? তোমার ব্যথা আমি সত্যি-সত্যি অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, "সুলতানা, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি।" তখন তোমার চোখে জল টলমল করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে কিছুদিন থাকুন। ভালো হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না-না আমি যাব না। সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। আপনারা দুজনে যান। সমুদ্রতীরে সব সময় দুজন করে যেতে হয়। এর বেশিও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তুমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, খুব শান্তভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে। রাস্তায় খিদে পেলে খাবার জন্যে একগাদা কী-সব তৈরি করে দিলে। তিনি বিদায় নিলেন খুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। তুমি মূর্তির মতো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোনো পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালোবাসার শিকলে বাঁধা যায়?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে করি নি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী জিনিস?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাতজোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। আপনার পছন্দমতো ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে-কোনো ছবি। যেটা আপনার ভালো লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন্ ছবিটি নেবেন জানো তুমি?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোট্রেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা 'এসো নীপবনে'। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেইসব পুরানো কথা তোমার কি মনে পড়ে? বয়স হলে সবাই তো নস্টালজিক হয়, তুমি হও নি? কুটিল সাপের মতো যে ঘৃণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কাঁদছ— এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কী করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারাজীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, "না।" তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা'র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বলেছ, "না।" কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শান্তস্বরে বলেছ, আমার মন ভালোই আছে।

আমি জানতাম ঘৃণার দেয়ালে বন্দি হয়ে একজন মানুষ বেশিদিন থাকতে পারে না। তোমার সামনে দু'টি মাত্র পথ। এক মরে যাওয়া, আর দুই...। কিন্তু মরে যাওয়ার মতো সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও একধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি এবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব তো?

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে গিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কী যেন বললে। আমি তাকালাম টেবিলের দিকে। বিষের সেই শিশিটি নেই। তুমি অপলকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেরে গেলে জরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জয় করা যেত। কিন্তু আমি তা চাই নি, সব ছেড়েছুড়ে চলে এলাম। অল্প ক'দিন আমরা বাঁচি। তবু এই সময়ে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কত গ্লানি, কত আনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ভেতরে হা হা করে।

জরী, এখন গভীর রাত্রি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোর্টার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানির মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আবার হয়তো কোনো এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এরকম লম্বা চিঠি লিখব। কিন্তু সে সব চিঠি কখনো পাঠাব না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে নি, আজ কি আর তা পারবে? কেন আর মিছে চেষ্টা!

